Available online at http://www.ijims.com
ISSN: 2348 – 0343

The History of Changing Address in The Novel 'Rohu Chandaler Haar'

ঠাঁই বদলের ইতিহাসঃ প্রেক্ষিত রহু চণ্ডালের হাড়

Rupasree Debnath

Dept. of Bengali, Tripura University, India

Abstract

In the era of Bengali literature, Abhijit sen is a famous novelist in recent time. He is famous mostly for his novel Rohu Chandaler Haar. In this novel, he represents the life of bajikars. Their living style is full of variety. They fellow few of their own customs in their life. The bajikar's were generally considered by the established society as nomads, thieves or beggars and transform into a race of peasant man. They have so many obstacles in their way of life. But they did not stop. They still fight to establish themselves as peasant man in order to get rid of their nomadic life. And after five generations shariba still carries out the legacy. The present paper tries to show nomadic people's struggles in different aspects regarding their life and works in the context of the novel Rohu Chandaler Haar.

Keywords:History, nomadic race, address, struggle, peasant man, Rohu Chandaler Haar.

Article

সাহিত্যের রাজপথে অনেক নিঃশব্দ পথচারী থাকেন, যাঁরা উচ্চকণ্ঠে এবং সরবে নিজেদের অস্তিত্ব ঘোষণা না করলেও পথের দু'ধারে নীরব কর্মের অক্ষয় চিহ্ন ছড়িয়ে রেখে যান। সকল পাঠকের চোখে তাঁরা ধরা পড়েন না ঠিকই, কিন্তু কালের ইতিহাসে তাঁদের হিসেব ধরা থাকে। ফলে তাঁরা তন্নিষ্ঠ পাঠকের চোখের আড়াল হতে পারেন না। এমনই একজন সাহিত্যসেবী হিসেবে আমরা ঔপন্যাসিক অভিজিৎ সেনকে পেয়ে থাকি।

১৯৮৫ সালে প্রকাশিত হয় অভিজিৎ সেনের জনপ্রিয় উপন্যাস 'রহু চণ্ডালের হাড়'। ১৯৯২ সালে 'বঙ্কিমচন্দ্রস্মৃতি' পুরস্কার লাভ উপন্যাসটির জনপ্রিয়তা অনেক বাড়িয়ে দেয়। অজানা অস্পষ্ট ধর্মের ধারক ও বাহক এক প্রান্তিক যাযাবর জনগোষ্ঠী এই উপন্যাসের প্রধান কুশীলব। শুধু বিষয়বস্তুর জন্য নয়, আখ্যান উপস্থাপনের অভিনবত্বের জন্য উপন্যাসটি চমক সৃষ্টি করে। আবার নামে ও প্রকরণেও উপন্যাসটি স্বাতন্ত্র্যের দাবীদার।

ব্যক্তিগত জীবনে লেখক বিভিন্ন স্থানে বসবাস সূত্রে বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। চাকরি এবং অন্যান্যসূত্রে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। দীর্ঘকাল উত্তরবঙ্গের বালুরঘাটে অবস্থানসূত্রে লেখক বিচিত্র ধারার কিছু মানুষের সংসর্গে এসেছিলেন, সেই অভিজ্ঞতা তাঁর মধ্যে যে প্রতিক্রিয়ার সূচনা করেছিল, তাতেই *'রহু চণ্ডালের হাড়'* উপন্যাসটি রচিত হয়। লেখক নিজেই বলেছেন—*" 'রহু চণ্ডাল' লেখার একটা ইতিহাস আছে।... 'রহু চণ্ডালের হাড়' শুধু এক শ্রেণীর যাযাবরের জীবন-সংগ্রামের কাহিনী নয়। এই যাযাবরগোষ্ঠী, আমার উপন্যাসে যে গোষ্ঠীর নাম বাজিকর,*

তাদের এক-দেড় শ বছরের ঘোরাফেরাকে কেন্দ্র করে আমি একটি বিস্তৃত অঞ্চলের ওই সময়কার ইতিহাস, সমাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য, ধর্ম ইত্যাদি বিষয়কে টুকরো টুকরো করে তুলে এনেছি।"[১] ১৯৭৩-১৯৭৪ সালে এক বছর তিন-চার মাস সময়ের জন্য লেখক তৎকালীন পশ্চিম দিনাজপুরের একটি সমবায় ব্যাংকে চাকরি করেছিলেন। সেই সময় বালুরঘাট মহকুমার তপন থানার কয়েকটি গ্রামে বাজিকর সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল। মধ্যে কিছুদিন বাদ দিয়ে ১৯৭৬-১৯৭৭ সাল থেকে আবার তিনি বাজিকরদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পান। এই কয়েক বছরে কাছ এবং দূর থেকে বাজিকরদের দেখার পুঁজি সম্বল করেই রহু চণ্ডালের হাড় রচনার সূত্রপাত। উপন্যাসে লেখক যাদের কথা বলেছেন সেই বাজিকর গোষ্ঠীর জীবন কাহিনিটি লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফসল। লেখকের স্ব-উপার্জিত অভিজ্ঞতার সঠিক ব্যবহারে ও নির্ভুল পর্যবেক্ষণে উপন্যাসটি গড়ে উঠেছে। বিষয়ের অভিনবত্ব এই উপন্যাসের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ।

'রহু চণ্ডালের হাড়' উপন্যাসের কথক বৃদ্ধা লুবিনি। আখ্যানের পর আখ্যান জুড়ে যে কাহিনি লিবিনির মুখে বর্ণিত হয়েছে তার শ্রোতা ছোট্ট নাতি শারিবা। উত্তবঙ্গের প্রেক্ষিতে গ্রথিত বাজিকরদের এই জীবনগাথায় তাদের গোষ্ঠীর বৃত্তান্ত পরিবেশিত হয়েছে। উপন্যাসের কাহিনি কম করেও দেড়শো বছর বিস্তৃত। উপন্যাসে দেড়শো বছরের সরণী-পরিক্রমার উল্লেখ থাকলেও বাস্তবক্ষেত্রে এই উপন্যাসের আরম্ভ ও সমাপ্তির মধ্যে সময়ের ব্যবধান পঁচিশ বছর। পঁচিশ বছরের মধ্যে স্মৃতির সূত্রে পীতেম থেকে শারিবা পর্যন্ত কয়েক পুরুষের ইতিহাস-চারণা এখানে অনুপম বর্ণনাভঙ্গীর সূত্রে উপন্যাসকে করে তুলেছে অসাধারণ গতিশীল ও চাঞ্চল্যকর। বাজিকর সম্প্রদায়ের পথ চলার দীর্ঘকাহিনি তথা এক যাযাবর জনগোষ্ঠীর কৃষি সভ্যতায় উত্তরণের ইতিহাস এখানে বর্ণিত হয়েছে। অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্য এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু সম্পর্কে লিখেছেন—*"স্থবিরতার বিপ্রতীপে উপস্থাপিত গতি এই উপন্যাসের অতন্দ্র সন্ধিকে তাৎপর্যবহ করেনি শুধু, সমাপ্তিবিহীন উপসংহারের মধ্য দিয়ে যাযাবর সম্প্রদায়ের গৃহস্থ হওয়ার সংকেতও দিয়েছে। পেছনে পড়ে থাকে অতীতের স্মৃতি ও বিষাদ; জীবনের অমোঘ নিয়মে এগিয়ে যেতে হয় শুধু সামনে—এই বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন অভিজিৎ। অজস্র মৃত্যুও বাস্তবের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে যায়, তবুও জীবনের দাবি মেনে নিয়ে যাযাবরের উত্তরসূরি বসত গড়ে।"*[২] পীতেম বাজিকর গোষ্ঠীর দলপতি, সে বাসযোগ্য ভূমির প্রত্যাশায় আবাদযোগ্য জমি খোঁজে। পূর্বপুরুষ রহুর সাবধান বাণী সত্ত্বেও দেখা যায় সমগ্র উপন্যাস জুড়েই তার উত্তরপুরুষেরা আশ্রয় খোঁজে বেড়ায়। সমাজের মূল স্রোতের প্রতিবেশী হয়ে আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক স্থিতিতে স্বস্তি চায় তারা। এভাবে ঠিকানার সন্ধানে তাদের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় কেটে যায় কয়েক পুরুষের কাল। অতিক্রম করতে হয় দাঙ্গা, লুঠ, খুন, নারীহরণ, প্রেম-ভালোবাসা ইত্যাদি। যুক্ত হয়ে যায় সামাজিক ইতিহাসের অনেক ভাঙা গড়া এবং ধারাবাহিক অজস্র উপলব্ধির পালাবদল।

(২)

নিয়তি পীড়িত সমাজ লাঞ্ছিত যাযাবর গোষ্ঠীর অস্থায়ী জীবনযাত্রায় অতি সংবেদনশীল কাহিনি হলো এই *রহু চণ্ডালের হাড়*। বাউদিয়া বাজিকর সম্প্রদায় ইতিহাসের তথাকথিত মূলধারায় ঠাঁই করে নিতে পারেনি। সমাজের অভ্যন্তরে পুনর্বাসিত হতে চাইলেও কার্যকারণ সূত্রে তারা বার বার প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও এদেশের মৃত্তিকার সঙ্গে তাদের নাড়ীর বন্ধন সুদৃঢ় হয়নি। আধিপত্যবাদী সমাজ বাজিকরের পেশাকে কখনো শ্রদ্ধার চোখে দেখেনি, আবার তাদের কোথাও থিতু হতে সম্মতি দেয়নি। কেন না আধিপত্যবাদী সমাজের কাছে এরা মন্ত্রবিবর্জিত, অপাঙতেয় ও অন্ত্যজ। এই যাযাবর সম্প্রদায় দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, অশিক্ষা আর অজস্র আদিম সংস্কারে আবদ্ধ।

বাদিয়া-বাউদিয়া বাজিকর সম্প্রদায়ের বর্গগত পরিচয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে লুবিনির কণ্ঠে--*"হামরা তো অছুতের জাত রে, শারিবা।"*[৩] এই বাজিকররা যুগ যুগ ধরে 'অছুৎ' হয়ে চিহ্নিত হয়ে আসছে বলেই ইতিহাসের মূলধারায় নিজেদের জায়গা করে নিতে পারেনি। তারা এতকাল ধরে পিতৃপুরুষের অজ্ঞাত পাপের দায় বহন করে চলেছে। পিতৃপুরুষের অজ্ঞাত পাপ যে আসলে নিম্নবর্গ হয়ে এই পৃথিবীতে জন্ম নেওয়া, তা অনুমান করতে অসুবিধা হয় না। নিজেদের স্বার্থেই প্রতাপশালী স্থিতিবান সম্প্রদায় দাবিয়ে রেখেছে এই নিম্নবর্গীয়দের, গ্রাস করে নিয়েছে তাদের চেতনার জগৎ। আধিপত্যবাদী সমাজ কখনো চায় না এতকালের অন্ত্যজ, অপাঙতেয় সমাজ মাথা তুলে দাড়াতে সক্ষম হোক, এই চিরসত্য কথাটি উপন্যাসে বিবৃত হয়েছে লুবিনির উক্তিতে—*"মানুষ চায়, বাউদিয়া বাউদিয়াই থাকুক, বাজিকর বাজিকরই থাকুক। তার আবার ঘর গেরস্থালী কি ?"*[৪]

বাজিকরদের জাত-ধর্মের কোনো পরিচয় নেই। তাদের নিজস্ব কোন ধর্ম বিশ্বাসও ছিল না। অথচ হিন্দু ও মুসলমান এই দুই প্রভাবশালী ধর্ম ও সমাজের মধ্যে অবদমিত বাজিকররা নিজেদের অস্তিত্ব নিয়ে সব সময়ই কেমন যেন অপ্রস্তুত। আলীর ওপর কালী, না কালীর ওপর আলী এই বৃত্তান্ত সে কারো কাছে জানতে চায় না। কিন্তু কালী বা আলীপ্রধান (হিন্দু ও মুসলমান) এই দুই বৃত্তের যে কোনো একটির অন্তর্ভুক্ত হতে চায়, গেরস্থ হতে চায় বাজিকররা। যুগ যুগ ধরে এদেশের মাটিতে লালিত হয়ে এই মাটিতেই স্থিতিশীল হতে চাইলে জাতহীনতার প্রশ্নে তারা সমাজবদ্ধ মানুষের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়েছে, প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। সাধারণ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র থেকে শুরু করে বৃহত্তর রাজনৈতিক পালাবদলের ক্ষেত্র পর্যন্ত প্রতিটি পদক্ষেপে এরাই বিপন্ন হয়েছে। জাতহীনতার সংকট থেকে মুক্তির জন্য ইয়াসিন বাজিকর নমশূদ্র দিগরপতি ভায়রোকে সকাতরে আবেদন জানায় তাদের জাতে তুলে নেবার জন্য। ভায়রো তার উত্তরে জানায়—*"হিন্দুধর্মে এমুন হক কেরো নাই। তুমু ব্রাহ্মণ, কায়েৎ, মাহিষ্য, সদগোপ, নমোশুদদুর কেছুই হবা পারবা না।"*[৫] বাজিকরদের নিজস্ব সমাজ নেই বলে তাদের সঙ্গে কোনো সামাজিক চুক্তি হয় না, আবার ধর্ম নেই বলে তাদের সঙ্গে ন্যায়নীতির কোনো সম্পর্ক নেই। আর এজন্যই ভাদুই ধানে ভরে ওঠা ইয়াসিন ও রূপা বাজিকরের জমি লালমিঁয়া এবং মহিমবাবু অনায়াসেই কেড়ে নেয়। বাজিকর নারীর সতীত্বের কোনো বড়াই নেই। জাত আর ধর্ম নিয়ে প্রশ্নের বেড়াজালে আবদ্ধ অসহায় এই সমাজের নারী সহজেই ভিন্ন সমাজের পুরুষের কামনায় বলি হয়। বাজিকর সমাজের নারীকে গৃহিণী করতে আপত্তি থকলেও তাকে ভোগ করতে আধিপত্যবাদী সমাজের কোনো অসুবিধা হয় না।

বাজিকরদের স্থিতিশীল হবার সুদীর্ঘ পথ-পরিক্রমা তথা লড়াইকে ঔপন্যাসিক বিশেষ গুরুত্ব সহকারে চিত্রিত করেছেন। স্থিতিবান হবার জন্য যাযাবর সম্প্রদায় বার বার আধিপত্যবাদী সমাজের সঙ্গে দ্বান্দ্বিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছে । রাজমহল, মালদা, নমনকুড়ি, রাজশাহী, আমুনাড়া, পাঁচবিবি ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গায় স্থানবদলে তাদের কত শিশু, নারী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা যে কালের কবলে টিকতে না পেরে হারিয়ে গেছে, তার কোনো হিসেব নেই। তবু বার বার তাদের গেরস্থ হবার বাসনা জেগেছে। কিন্তু তবু বাজিকর স্থিতিশীল মানুষ হতে চায়। বাজিকর চোর, বাজিকর ভবঘুরে, বাজিকর ভিখারি তারা আর এসব কথা শুনতে চায় না। স্থিতিশীল হতে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী মানুষের সঙ্গে তাদের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়েছে আর পরিণতিতে তাদেরকে পরাজয়ের ভাগ্যকে বরণ করতে হয়েছে। দ্বান্দ্বিক বিবর্তন বাজিকরদের দিনযাত্রাকেও প্রভাবিত করেছে। ফলে এক সময় আসে পর্বান্তরের পালা, অনেকেই যাযাবর বৃত্তি ত্যাগ করে বিভিন্ন পেশায় যুক্ত হয়ে যায়। দলছুটভাবে নানা স্থানে নিজেদের মতো করে ডেরা বাঁধতে শুরু করে। বিহারের রাজমহল থেকে দলগতভাবে তাদের যে পথ-পরিক্রমা শুরু হয়েছিল, দেড়শো বছর পর গৌড়ে (মালদহ) এসে যেন তা কিছুটা থিতু হতে পেরেছে। অনেকেই পৃথক পৃথক ভাবে খানিকটা হলেও নতুনভাবে বসতি স্থাপনের চেষ্টা করেছে।

(৩)

গৃহস্থ হতে চাওয়ার মধ্যেই বাজিকর সম্প্রদায়ের আজীবন সংগ্রাম চলেছে। মুসলমানের সহায়তায় বাজিকর চাষ করার চেষ্টা করে ধান, তরমুজ প্রভৃতি ফলিয়েছে। বাজিকরের উত্তরসূরী শারিবা অল্প বয়স থেকেই হাপু গান শুরু করে। হাপু গান দীর্ঘ ছড়ার মতো, গান ও আবৃতির মাঝামাঝি একটি সুরে গাওয়া হয়। হাপু গান পরিবেশনের মাধ্যমে শারিবা উপার্জন করে। কিন্তু চেষ্টা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের মতো কিছুতেই তারা গৃহস্থ হতে পারে না। একবার সাওতাল, একবার মুসলমান এই দুই জাতির সঙ্গে মিশ্রিত হবার চেষ্টা করেও তারা বার বার পিছিয়ে আসে। চাষাবাদ বাজিকরদের জীবনে স্থায়ী না হলে পেটের তাগিদে তাদের ফিরে যেতে হয়েছে আদিম সংস্কার ও জীবনযাপন পদ্ধতির মধ্যে। কেননা বেঁচে থাকাতাই হচ্ছে আসল। অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম করতে গিয়ে আবার ঢোলকে বাড়ি পড়ে—*"ডুগ্‌ডুগ্‌, ডুগ্‌ডুগ্‌, লাগ্‌ ভেলকি লাগ্‌, চোখে মুখে লাগ্‌ হামারে ছাড়্যে সবাকে লাগ।"*[৬] এভাবেই বাজিকর জাতি জনসাধারণকে রহু চণ্ডালের হাড়ের কিসমৎ দেখায়।

শেষ পর্যন্ত যাযাবর বাজিকর জাতি তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখতে না পেরে ঠাঁই নেয় মুসলমান সমাজে। এই মুসলমান সমাজের ধর্মভাবনা ও আচার আচরণের সঙ্গে তারা নতুন করে মিলিত হয়। খাদ্য কিংবা নামের দিক থেকেও মুসলমানের সঙ্গে বাজিকরের মিল বেশি। হিন্দুকে বিয়ে করায় রূপা বাজিকরের রক্তে হিন্দুত্বের সংস্কার ঢুকে যাওয়ায় সে মুসলিম হয় না। বিষহরির গান বাজিকর গায় না, কিন্তু রূপা বাজিকর গায়।

(৪)

এই উপন্যাস পাঠ করতে করতে পাঠকের এই ধারণাই জন্মাবে যে, বর্তমান রচনায় ঔপন্যাসিক বহুমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি অঙ্কনের ক্ষেত্রে সফল হয়েছেন। তাই দেখি, উপন্যাসের অপর একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক হলো, বাজিকর সমাজের সংস্কার, বিশ্বাস ও সংস্কৃতির দিক। উপন্যাসের সুদীর্ঘ কাহিনিতে এসেছে অজস্র লোকউপাদান। এই রচনায় প্রত্নকথা, আদিকল্প ও কিংবদন্তির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বাজিকরদের দেড়শো বছরের পথ-পরিক্রমার বিবরণে ধরা আছে ভ্রাম্যমান অতীত জীবন চর্চার নানা গল্প, গাথা, গান, লোকজীবনের যাবতীয় উপকরণ। সংস্কৃতির এক স্বতন্ত্র বলয়ে বাজিকরদের বসবাস, যা লেখকের উপস্থাপনা গুণে পাঠকের মানসদর্পণে স্থায়ী ছাপ ফেলে। উপন্যাসের শুরুতেই তাদের বাসস্থানের চিত্রটি লক্ষ করা যায়। নিচু দাওয়ায় শনের চালা আর তালপাতায় বেড়া দেওয়া তাদের ঘর। যাযাবর গোষ্ঠী আটমাস-দশমাস দুনিয়া ঘুরে বেড়াবার নেশায় ভাল্লুক, বাদর সংগ্রহ করে, ভইস চুরি করে। মোষের পিঠে করে বাচ্ছা আর বুড়ো বুড়িরা পথ অতিক্রম করে। কখনো নদীর পাড়ে কখনো শহরের বাইরে প্রাচীন বটের তলায় তারা ডেরা বেঁধে বাস করে।

বাজিকররা বিভিন্ন খেলা দেখিয়ে জীবন অতিবাহিত করে। বাঁদর-ভাল্লুকের খেলা, পিচলু বুঢ়া পিচলু বুঢ়ির কাঠের পুতুল নাচানো, বাঁশবাজি, দড়িবাজি, নররাক্ষস হয়ে মাংস ভক্ষণ, নাচা গাওয়া এসবের মাধ্যমে রোজগার করে তারা জীবন যাপন করে। রহু চণ্ডালের মিথের আবহ সমগ্র উপন্যাসে এক অমোঘ ছায়া বিস্তার করে রাখে। আবার পুরা ও পালিকে নিয়ে রচিত লোককাহিনি বাজিকরদের সারাজীবন ধরে যাযাবরী বৃত্তির পেছনে কাজ করেছে। লোককাহিনিটি হলো এরূপ- বাজিকর সমাজের আদিপুরুষ পালি পুরা নর্তকীকে বিয়ে করলে সঙ্গে সঙ্গে দেবতার অভিশাপ নেমে আসে। সমাজের বহু মানুষ নষ্ট হয়। পুরা ও পালি দেশ দেশান্তর ঘুরতে থাকে। অভিশাপ অনুযায়ী পুরা ও পালি এক মৃত্তিকায় দুবার পদার্পণ করতে পারবে না। সে থেকেই বাজিকর পথে প্রান্তরে ঘুরছে।

বাজিকর সম্প্রদায়ের যাবতীয় শারীরিক কসরৎ ও বিচিত্রমুখী খেলাধূলার চিত্র পাওয়া যায় রাজমহল পাহাড়ে কালীপূজোর অনুষ্ঠানে। কখনো রহুর হাড়ের কেরামতিতে নিমেষে টাকা দ্বিগুন হচ্ছে, যাদুদণ্ডের ছোঁয়ায় যুবতীর লম্বা বিনুনি মাথার উপর খাড়া হয়ে আবার সোজা হচ্ছে। আবার কোথাও নিমেষে গাছ থেকে ফল, ফল থেকে গাছ তৈরী হচ্ছে। সমস্তই তাদের নিজস্ব জাতিগত খেলা যা লেখকের নিপুণ লেখনীর আঁচড়ে উপন্যাসে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এছাড়াও বাজিকরদের নিজস্ব সংস্কৃতি, টোটেম বিশ্বাস, গান, রীতিনীতি ইত্যাদি ঘটনাসূত্রে উঠে এসেছে। লুবিনির স্মৃতিতে উঠে আসে বাজিকর 'নওরঁ-নওরিঁ'র (বর-বধূ) ছবি। লুবিনির কণ্ঠে মূর্ছনা তোলে বাদিয়া-বাজিকরদের বিয়ের গান-

" দেও আওয়েতো দেওরে ভাই
বান্ধনা তো সরিমাদে
দেও আওয়েতো দেওরে ভাই
মাকারানা সরিমাদে ।"[৭]

বিবাহের অনুষ্ঠানে 'নওরঁ-নওরিঁ'র হলুদমাখার প্রসঙ্গও ধরা পড়ে লুবিনির গানে –

"এ সে হালদি লাগিরে, এতো মায়েরি,
তেল মেশুরে লুড়ে, এতো মায়েরি।"[৮]

এই উপন্যাসে বাজিকর সমাজের বিবাহ অনুষ্ঠানের একটি সুন্দর ছবি পাওয়া যায়। সম্পূর্ণ বাজিকর রীতিতে লাল সুতোয় ঘেরা চৌহদ্দির মধ্যে ষোল জোড়া বালক বালিকার বিয়ে হয়। সেখানে মেয়েরা গান গায়-

"লাল পাড়াঙ্গি রেশকি ডোরি
দেও আওয়েতো দেওরে ভাই।"[৯]

এ হচ্ছে বাজিকরদের নিজস্ব সংস্কৃতির জগৎ। অন্যদিকে সভ্যসমাজ থেকে ভিন্ন এই বাজিকরদের জাতিগত পেশা হলো বিভিন্ন খেলা দেখানো। তাদের এই খেলার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাজিকরদের আদিপুরুষ রহুর হাড়ের সম্পর্ক। সেই রহু চণ্ডালের হাড়ের ছোঁয়ায়ই তাদের যত ভেলকি, ভানমতির খেলা। নিজস্ব জাতিগত খেলা দেখানোর মাধ্যমে পয়সা অর্জনকে তারা 'ভিখ-মাঙ্গার কাম' বলে থাকে। তাদের রয়েছে নিজস্ব পোষাক, রমণীদের জন্য ঘাঘরা, কামিজ এবং পুরুষের জন্য নগরু আর কুর্তি ।

শুধুমাত্র বাজিকর সমাজ নয়, সাওতাল সমাজ ও মালো ঝালো সম্প্রদায় সম্পর্কেও লেখকের অভিজ্ঞতা ধরা পড়ে। নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে যাযাবর সম্প্রদায় সাওতাল পাড়ায় গেলে সেখানে সাওতালদের লোকবিশ্বাস ও সংস্কারের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন- সাওতালদের গ্রামগুলিতে ঢোকার মুখে দেখা যায় গরুর চামড়া ও আড়াআড়ি একজোড়া বাঁশি টাঙানো। মোড়ে পুতে রাখা ঝাণ্ডা, ঘণ্টা ও ভাঙা কুলো। আতপ চাল, মেথির গুঁড়ো আর তেল সিঁদুর দিয়ে গোলাকার খড় সাজিয়ে অঘ্রাণ মাসে তারা গোয়াল ঘরে মারাংবুরু এবং ঠাকরাণের পুজো করে। মোষ, শূকর, সাদা মোরগ বলি দেওয়া হয়। অন্যদিকে মালোরা বিবিধ আচার সংস্কার পালন করে একদিন গলুইয়ের ওপর ফুল পাতা সিঁদুর ধূপ দিয়ে *'জয় মা গঙ্গা'* বলে নদীতে ঝাঁপ দেয়। আর ঝালো সম্প্রদায় মাছ ধরে পুকুর বা নালাতে নিতান্ত আটপৌরে জাল দিয়ে। পুরুষের পরনে অধিকাংশ সময়েই থাকে একফালি ত্যানা, মেয়েদের খাটো শাড়ি। মাছমারা সম্প্রদায়ের চড়ক উৎসবেরও পরিচয় পাওয়া যায়।

(৫)

অভিজিৎ সেন আলোচ্য উপন্যাসের ষোড়শ পরিচ্ছেদে নির্লিপ্তভাবে বাস্তব ও অতিকল্পনার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে তাঁর শিল্প কর্মটিকে যেভাবে প্রকাশ করেছেন, তাতে উপন্যাসটিকে 'ফ্যান্টাসি' বা 'রূপকথা' বলে মনে হয়নি। নেশাগ্রস্থ পীতেম প্রতিদিন যে গাছটির নীচে বসত, চাঁদনী রাতে সে গাছটি হারিয়ে গেল, আর সেখানে দাঁড়িয়ে রইল পীতেমের মৃত পিতা দনু। দনুকে দেখে পীতেম আঁতকে ওঠেনি, খুব স্বাভাবিকভাবেই পীতেম নিশ্চিন্তে দনুর পায়ের কাছে বসেছে, কথা বলেছে। বাজিকদের এগিয়ে যাবার রাস্তা সম্পর্কে রহুর নির্দেশ কি, দনু সে বিষয়ে পীতেমকে অবহিত করে। আরও বিবৃত করে যাযাবরদের পূর্বতন স্থিতিশীল জীবনে প্রতাপের আক্রমন ও দলনেতা রহুর মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনা এবং বাজিকরদের ভূমিহারা হওয়ার ইতিবৃত্ত। রহুর ঘটনাটি এক স্বপ্নময় বাস্তব হিসেবে পাঠকের মনোজগতে ধরা দেয়। লেখক যেন তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান। একই সঙ্গে পাঠকসমাজও উপন্যাসের চরিত্রদের ভাবনাজালে পড়ে যান একেবারে নিজেদের অজান্তে। বাজিকর সমাজ যেদিন তাদের এগিয়ে যাবার সূচনা করেছিল, সেদিন থেকেই তারা জানে রহু সবসময়ই তাদের সঙ্গে রয়েছে। রহুকে নিয়ে প্রচলিত কাহিনির ধূসরায়িত অতীর বারবার ছায়া ফেলেছে উত্তর প্রজন্মের জীবনে। বাজিকর জনগোষ্ঠীর বহুযুগ সঞ্চিত প্রত্নস্মৃতি তাদের গোষ্ঠী জীবনের বিভিন্ন অনুপুঙ্খে প্রচ্ছন্ন রয়েছে। দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি পীতেম-জামির প্রত্যেকেই রহুকে দেখতে পায়। এক অতীন্দ্রিয় জাদুময়তার টানে পাঠকও এই ঘটনাকে সর্বান্তকরণে সত্য বলে মেনে নেন। তখন ঘটনার সত্য মিথ্যা যাচাই করার অবকাশ থাকে না। এ হলো উপন্যাসের গতিময়তা, বলাবাহুল্য যাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। লেখক যেভাবে পাঠককে কল্পনার জগতে নিয়ে গেছেন, সেখানে যুক্তি ব্যাপারটাই যেন যুক্তিহীন হয়ে পড়েছে। পরিবর্তনশীল শিল্পের এই বিবর্তিত প্রশাখা 'ম্যাজিক রিয়েলিজম' বা 'জাদু বাস্তবতার' প্রসঙ্গটি উপন্যাসের একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক।

(৬)

যাযাবরদের নিজস্ব মুখের বুলি ছিল, যা যাযাবর জীবনের পথ ভ্রমণে অনেকটাই পাল্টে গেছে। ঠাঁই বদলের সুদীর্ঘ জীবন-ইতিহাসে তাদের ভাষায় বৈচিত্র্যের কারণ উঠে এসেছে—*"এলা বুলি বাজিকর দ্যাশ দ্যাশ ঘুর‍্যে শিখা লয়। যেথায় ঘুরে সিথাকার বুলি ধরে লয়, সিথাকার ধরম করম শিখ্যে লয় । সিটা তার আপন বুলিতে মিশাল কর‍্যে লয়।"*[১০] একস্থান থেকে অন্যস্থানে ঘুরে ঘুরে যাদের জীবন অতিবাহিত হয়, তাদের ভাষাও যে পরিবর্তিত হয়ে যাবে, সে তো স্বাভাবিকই। তাদের ভাষায় মিশে গেছে বিভিন্ন স্থানের মুখের বুলি। তবে উপন্যাসের বিভিন্ন স্থানে কথোপকথনসূত্রে তাদের নিজস্ব শব্দের ব্যবহার যে একেবারেই নেই, তা নয়। অনেক স্থানেই তাদের সংলাপে ধরা পড়ে তাদের নিজস্ব শব্দ, ভিন্ন ধরণের বাকরীতি। ভাষার ন্যায় বিভিন্ন দেবদেবীও তাদের পথের সংগ্রহ। ওলামাই, বিগামাই, কালিমাই এ সমস্ত অজ্ঞাত দেবতা বাজিকরদের পথের সংগ্রহ, তাদের নিজস্ব কিছু নয়। তাদের বিশ্বাস দেবী বিগামাই রুষ্ঠ হলে 'হাতপাক' রোগ অর্থাৎ জ্বর হয়। বিভিন্ন স্থানে বসবাসের ফলে এই যাযাবর জাতি পরিবর্তিত সময় ও ভিন্ন সমাজকে গ্রহণ করেছিল। যাযাবর সমাজের পাত্র-পাত্রীর নামকরণে যার প্রমাণ পাওয়া যায়। পীতেম, ধন্কু, রূপা, শারিবা, জামির, ইয়াসিন, সালমা, লুবিনি, মালতী ইত্যাদি নামকরণ একটা মিশ্রণের চিহ্ন বহন করে।

রহু চণ্ডালের হাড় উপন্যাসে সমাজ নামক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত বাজিকর সম্প্রদায়ের জীবনকে ঔপন্যাসিক একাধিক দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরেছেন। বাজিকর সমাজেরই একজন যোগ্য শরীক হিসেবে তিনি যেন তাদের সুদীর্ঘ

পথচলার সাক্ষী। বিষয়ের অভিনবত্ব থাকায় উপন্যাসের আঙ্গিকে এসেছে কথকতার ভঙ্গি। উপন্যাসের ভাষা প্রতিটি ছত্রেই ব্যঞ্জনাগর্ভ অথচ প্রাঞ্জল। লেখকের বর্ণনায় মনোগ্রাহী হয়ে উঠেছে বাজিকর সম্প্রদায়ের বিচিত্র জীবনধারা। এদের জীবনলীলা চিত্রণের মাধ্যমে ঔপন্যাসিক যেন কোনো অদৃশ্য স্রষ্টার দুর্জ্ঞেয় রহস্যলীলাকেই সকলের দৃষ্টি গোচর করতে চেয়েছেন। পীতেম, জামির কিংবা অন্যান্য বাজিকরের মতো শারিবাও জানে রহুর হাড় লুকিয়ে আছে কোনো এক অজানা ভূখণ্ডের মাটির গভীরে। সে স্থানটি বাজিকর খোঁজে বের করতে চায়। সে স্থানটি খোঁজে বের করতেই তাদের পথে পথে ঘোরা। বাজিকর সমাজের সকলেই রহুর হাড়ের সন্ধান করে নিজের মতন করে এবং তাদের বিশ্বাস সেই ভূখণ্ডেই হবে তাদের স্থিতি, স্থায়িত্ব, স্বস্তি ও শান্তি।

উল্লেখপঞ্জিঃ

[১] কালের কণ্ঠ (অনলাইন পত্রিকা), ২৯ মে ২০১১, Accessed date 15-05-2014.

[২] তপোধীর ভট্টাচার্য, উপন্যাসের বিনির্মাণ, পৃ- ২৩৬।

[৩] অভিজিৎ সেন, রহু চণ্ডালের হাড়, পৃ- ২২০।

[৪] ঐ, পৃ-১।

[৫] ঐ, পৃ-২০২।

[৬] ঐ, পৃ-১৭৫।

[৭] ঐ, পৃ- ১৭৭।

[৮] ঐ, পৃ- ১৭৭।

[৯] ঐ, পৃ- ১৫৯

[১০] ঐ, পৃ- ২।

গ্রন্থঋণঃ

১) অভিজিৎ সেন, রহু চণ্ডালের হাড়, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৫ ।

২) তপোধীর ভট্টাচার্য, উপন্যাসের বিনির্মাণ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১০।

৩) দেবাশিস ভট্টাচার্য, বিশ শতকের বাংলা কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গীয় চেতনা, অক্ষর পাবলিকেশনস্, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ ২০১০।

৪) কালের কণ্ঠ (অনলাইন পত্রিকা), ২৯ মে,২০১১ ।